অসংগতি

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচি

প্রাককথন / ৭

পাপে পাপ আনে / ৯

আমার দাড়ি আমার গর্ব / ১৩

নূরানী ধোঁকা / ১৮

যথার্থ নির্বাচন / ২৪

কবর-ঘরের খবর / ২৯

সুপারিশের প্রতীক্ষা / ৩৩

হিস্ট্রির হিস্ট্রি / ৩৯

আত্মপ্রবঞ্চনার ফাঁদ / ৪৪

রিংটোন ও ফোনকল / ৫০

রিযিক / ৫৪

আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতা / ৫৯

মোহরানার মহড়া / ৬৬

আপনার সন্তান আপনার আমানত / ৭২

একজন মুসল্লির সাথে / ৭৬

তাওফীক / ৮২

নারী অধিকার আন্দোলন : ভুল পথে যার পথচলা / ৮৭

নারী : বঞ্চনা যার সর্বত্র সঙ্গী / ৯১

সহজ আমল সহজ নেকি / ৯৪

সুখে থাকার সূত্র / ১০০

একটি প্রোপিক ও কিছু ভাবনা / ১০৪

লা আদরী / ১০৮

সালাম নিয়ে কিছু কালাম / ১১৩

বহুবিবাহ প্রসঙ্গ / ১২০

ভার্চুয়াল জগতে যাপিত জীবন / ১৩০

ধোঁকা / ১৩৫

তারা এবং আমরা / ১৪১

বোধের বদ্ধ দুয়ার খুলে যাক / ১৪৬

প্রাক্কথন

আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবনের বাঁকে-বাঁকে ছড়িয়ে আছে হাজার রকমের অসংগতি। অসংগতি লুকিয়ে আছে আমাদের চিন্তায়, আমাদের ভাবনায়; আমদের মন-মননে ও মানসিক অঙ্গনে; আমাদের চলনে-বলনে, আচরণে-উচ্চারণে এবং যাপিত জীবনের নানাবিধ প্রাঙ্গণে।

এসব অসংগতি একেকটা ভাইরাস। কৃষকের সাজানো সুজলা-সুফলা খামার যেমন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি আমাদের ঈমান-আমলের সবুজ মাঠও অসংগতির করালগ্রাসের মুখে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। এসব অসংগতি থেকে জন্ম নেওয়া অন্ধকার কখনো কখনো ঢেকে দেয় জান্নাতে পৌঁছানোর আলোকিত পথ। এসব কারণেই অসংগতির এই ভাইরাসগুলো চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি।

যেকোনো রোগের চিকিৎসা করার জন্য আগে রোগ নির্ণয় করতে হয়। এটি একটি স্বাভাবিক নিয়ম। আমরা অনেক সময় জানিই না, কোনো ধরনের অসংগতিতে আমরা জড়িয়ে আছি। আমাদের প্রাত্যহিক বহু কাজ সংগতিপূর্ণ মনে করেই আমরা সম্পাদন করে থাকি। অথচ দেখা যায় বাস্তবে তা অসংগতিতে পরিপূর্ণ।

বয়ে চলা নদীর মতো জীবনও চলতে থাকে আপন গতিতে। নায়ের মাঝি যেমন ঢেউয়ের তালে তালে বৈঠা বেয়ে সামনে এগিয়ে যায়, জীবন নায়ে চড়ে আমিও সেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি প্রতিদিন। এই চলতি পথে হর-হামেশা দেখা হয়ে যায় অনেক দৃশ্যের সাথে। যার মাঝে কোনোটাতে থাকে সংগতি আর কোনোটাতে অসংগতি। যেগুলোতে অসংগতির দেখা পেয়েছি সেগুলো সযত্নে তুলে নিয়েছি। তারপর তা দিয়ে মালা গেঁথে উপস্থাপন

করেছি পাঠকের সমীপে।

ভিন্ন ভিন্ন পঁচিশটি লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে এই বইটি। একেকটা একেক রঙের, একেকটা একেক বর্ণের। তবে সবগুলোই কোনো না কোনো অসংগতির সাথে প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে আবদ্ধ।

এই বইতে গুরু-গম্ভীর ভাব বর্জন করে আমি চেষ্টা করেছি পাঠকের সাথে আলাপে মগ্ন হতে। গল্পের ঝাঁপি খুলে তাদের সাথে একনাগাড়ে কথা বলে যেতে। রাতের আঁধারে উঠোনে বিছানা পেতে চেরাগের আলোয় যেভাবে শৈশবে আমরা গল্পের মজমায় হারিয়ে যেতাম; ঠিক সে ঢঙে। তবে কথার ফাঁকে ফাঁকে আয়াত বা হাদীস এলে টীকা-ঘরে তাকে হাজির করতে ভুল করিনি।

বইটিতে উপস্থাপিত অধিকাংশ লেখাই বিভিন্ন ম্যাগাজিনে, অনলাইন পোর্টালে বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কোনো কোনো সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীর বারংবার নিবেদন ছিল সেগুলো এক মলাটে আবদ্ধ করে ফেলতে। নানান ব্যস্ততায় সে সুযোগ হয়ে উঠছিল না। আল্লাহর মেহেরবানিতে এবার তাদের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হলো। সেই সাথে আমারও মনের গহিন কোণে কলি হয়ে থাকা সুপ্ত একটি স্বপ্ন প্রস্ফুটিত হলো। সবই রব কা শুকরানা।

আশা করি পাঠকদের বইটি ভালো লাগবে। এর ভেতরে তারা এমন সব অসংগতির দেখা পাবেন, যা হয়তো তার ভেতরেও মজবুতভাবে শেকড় গেড়ে বসে আছে। বইটি যদি কারও ভেতর থেকে সামান্য কোনো অসংগতি দূর করতেও ভূমিকা রাখে, তবে আমি নিজের কষ্টকে সার্থক বলে মনে করব।

আল্লাহ তাআলা এই বইটিকে কবুল করে নিন। প্রকাশকসহ আরও যারা নানান পর্যায়ে বইটি ছাপা হয়ে আসার পেছনে ভূমিকা রেখেছেন তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
২৪. ০৩. ১৪৪০ হিজরী
০২.১২.২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

পাপে পাপ আনে

বাসে ওঠার পর থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ করছি। ছেলেটা উবু হয়ে আছে। হাতে অ্যান্ড্রোয়েড মোবাইল। দুই চোখের পাতা স্ক্রিন থেকে সরছেই না। বাস চালকের কষে ব্রেক করার কারণে ইতিমধ্যে দুই দুইবার আমি তার শরীরের সাথে ধাক্কা খেলাম। কিন্তু তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হলো না। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে আগের মতোই উবু হয়ে থাকল।

তার ভাবান্তর না হলেও আমি ভাবান্তরিত হলাম। কী এমন জিনিস ছেলেটাকে অত ভাবলেশহীন করে তুলেছে! একটু পরে তার পাশের সীটটা খালি হলো। আমাকে সে জায়গা করে দিল বসতে। এবার তার মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম ফেসবুক চালাচ্ছে। ভাবলাম, এই সামাজিক মাধ্যমটাতে এমন বুঁদ হয়ে পড়ে থাকার কী আছে!

বাস চলছিল আপন গতিতে। ছেলেটা আমাকে জায়গা করে দিয়ে আবার মনোযোগী হলো মোবাইলের প্রতি। আমি জানালা দিয়ে ইট-পাথরের ঢাকার ব্যস্ততা দেখছিলাম। মানুষের ছুটোছুটি, গাড়ির দৌড়াদৌড়ি আর রিকশার টুংটাং চারপাশকে কেমন জীবন্ত করে রেখেছে। হকারের হাঁকডাক, ভিক্ষুকের করুণ চাহনি, ট্রাফিক পুলিশের ডিউটি আর আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সারি-সারি বিল্ডিংয়ের পরিচিত সব দৃশ্য একে একে পাশ কেটে যাচ্ছিল।

একটু পর আবার চোখ গেল ছেলেটার দিকে। এবার বেশ কৌতূহল হলো তার কাণ্ড দেখে। সে একটা ছবি বারবার জুম করে দেখছে। সানগ্লাস পরা একজন ললনার ছবি।

সম্ভবত কোনো ট্যুরে গিয়ে তোলা। বেশ স্টাইলিশ আর সাজুগুজু করা। ছবিটাকে জুম করে করে নানাভাবে, নানা আঙ্গিকে দেখতে লাগল সে। ছবিটা দেখা শেষ হলে এবার আবার আরেকটা। এরপর আরেকটা। এভাবে পুরাটা পথ দেখলাম সে একই কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ফিমেল আইডিতে ঘুরে ঘুরে তাদের ছবি দেখা, বেশি পছন্দ হলে সেভ করে রাখা, সেগুলো আবার নানান আকার-আঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ করা—পুরাটা সময় এটাই ছিল তার কাজ। ফার্মগেট আসতেই ছেলেটি নেমে গেল।

আমার মাথায় তখন রাজ্যের ভাবনা এসে ভিড় করেছে। এখানে আমি ছেলেটাকে দোষী করব, না যেসব মেয়ে অবাধে পাবলিকলি তাদের ছবিগুলো ছড়িয়ে রেখেছে তাদের দোষী করব ভেবে পেলাম না। আমার ভাবনারা যখন কাকে প্রথমে দোষী করব সে চিন্তায় মগ্ন তখনই একটা আয়াত কল্পনায় ভেসে উঠল।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "তিনি চোখের খেয়ানত এবং অন্তরের লুক্কায়িত ভাবনাগুলোরও খবর রাখেন।"[১] তো ছেলেটা হয়তো মনে মনে ভেবে বসে আছে, আমি যে অমুক অমুকের ছবি দেখছি ঘুরেঘুরে এটা তো আর তারা জানে না। অথচ তারা বা অন্য কেউই না জানলে কী হবে, এমন একজন তো আছেন যিনি সবকিছুই জানেন। পিপীলিকার হাঁটার শব্দ থেকে শুরু করে গভীর জলে সাঁতরে চলা মাছের খবরও তিনি রাখেন। তাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকে না। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা।

ছেলেটির নৈতিক শিক্ষার যে কমতি আছে সেটা তো নিশ্চিত করেই বলা যায়। নইলে তো এটা যে একটা অনৈতিক ও গর্হিত কাজ এটা সেও ভালো করে জানে। কিন্তু সেই জানাটা পোক্ত না হবার কারণে তা মানায় পরিণত হতে পারেনি। শৈশব বয়সে হৃদয়ের গহিনে নৈতিকতাকে গ্রথিত করে দেওয়ার যে ঐতিহ্য ছিল আমাদের সমাজে, সেটি যে দিন দিন উধাও হয়ে যাচ্ছে এসব চিত্র থেকে তা সহজে অনুমিত হয়। এই চরিত্রগুলো আমাদের ভয়ংকর-সব বার্তা দিচ্ছে। এমন একটা প্রজন্মকে সামনে আমরা পাব, যাদের কাছে নৈতিকতা বলে কিছু থাকবে না। প্রবৃত্তির অনুসরণ আর 'মন যা চায়' তার অনুগামী হওয়াই হবে এদের জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া।

এসব ভাবতে ভাবতেই আরেকটি হাদীসের কথা মনে পড়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ভালো কাজের পথপ্রদর্শকও ভালো কাজকারীর মতোই।"[২] তো একটা ভালো কাজ সম্পাদনের কারণ যিনি হচ্ছেন, তিনিও যেহেতু

[১] সূরা গাফির, ৪০ : ১৯

[২] সুনান তিরমিযী, ২৬৭০; সনদ সহীহ

সেই ভালো কাজের অংশীদার হচ্ছেন এবং সে জন্য সওয়াবেরও ভাগীদার হচ্ছেন; এখান থেকে বুঝে আসে, মন্দ কাজের কারণ যিনি হবেন, মন্দত্বের একটা অংশ তাকেও বহন করতে হবে। তাকেও কিছু গুনাহের ভাগ নিতে হবে। কারণ, একজনের পাপ আরেক জনের পাপকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সুতরাং সেসব নারী, যারা অবাধে নিজেদের রং-ঢঙের নানান ছবি প্রদর্শন করছেন, তাদেরও এখানে একটা দায়বদ্ধতা থাকে। তারা এখানে ঘটনার অনুঘটকের ভূমিকায় থাকছেন। নিজেদের খোলামেলা ছবি যদি ফেসবুকের মতো উন্মুক্ত প্লাটফর্মে প্রদর্শন না করতেন তবে বিকৃত মানসিকতা লালনকারী ছেলেপেলেরা এমন কর্মের সুযোগ পেত না। তারাও বেঁচে যেতেন গুনাহের ভাগীদার হওয়া থেকে।

কোনো কোনো নারী হয়তো প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারেন, 'আমি নিজেকে প্রদর্শন বন্ধ করে দিলেই কি সেসব ছেলে দিব্যি ভালো মানুষে পরিণত হবে? তারা এসব কর্ম ছেড়েছুড়ে সাধুতে পরিণত হবে?' তাদের বলি, অন্যজন পরিবর্তন হলো কি হলো না সেটা নিয়ে আপনি যতটুকু চিন্তিত হচ্ছেন তারচেয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত আপনার নিজের কর্ম নিয়ে। কারণ, সে ছেলে ভালো হোক বা না হোক সে দায় তো তার। আপনি অন্তত নিজে ঠিক থেকে নিজেকে অন্যের পাপের কারণ হওয়া থেকে রক্ষা করুন। এটাই হলো আপনার জন্য বড় পাওনা। 'আমি বদলালে কি গোটা পৃথিবী বদলাবে?' এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতে গেলে পৃথিবী কোনোকালেই সুন্দর-শালীন হবার সুযোগ পাবে না। কারণ, কেউ না কেউ তো অপকর্ম আর অপরাধ করেই যাবে। মনে রাখবেন, আমরা প্রত্যেকে পরিমাপিত হই নিজেদের কর্ম দিয়ে। অন্যের কর্ম দিয়ে নয়।

নৈতিকতা আর ধর্মের প্রসঙ্গ যদি বাদও দিই তবুও তো এমন কর্ম আমাদের কাম্য হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। কত শত ঘটনা আছে, অমুকে অমুকের ছবি ফটোশপ করে নেটে ছড়িয়ে দিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের মামলাগুলো খোঁজ নিলেই এমন ভূরি ভূরি উদাহরণ মিলবে। তো নিজের নিরাপত্তার খাতিরে হলেও তো আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। আমার ঘর আমি খোলা রাখব না বন্ধ রাখব তা তো সম্পূর্ণই আমার নিজস্ব ব্যাপার। তারপরও তো রাতে ঘুমোতে গেলে দরজার খিল আর ছিটকিনিটা ভালোমতো এঁটে নেই। কারণ, আমি জানি, সব জায়গায় অধিকার খাটাতে গেলে পস্তাতে হয়। চোর বেটা তো আর অত নীতিকথা মানে না। সে নিজের মতোই নিজের কাজ করে যাবে। রাতে এসে একফাঁকে যা পাবে সব মেরে দিয়ে সটকে পড়বে।

মূলত পাপ হলো একটা চেইন সিস্টেমের মতো। একটা অপরটাকে টেনে আনে। একটা পাপ করবেন, দেখবেন শত পাপের দরজা খুলে যাচ্ছে। আপনি নিজের খোলামেলা

ছবি পাবলিকলি প্রদর্শন করে পাপ করলেন। সেই সূত্র ধরে ওই ছেলেটা আপনার ছবিগুলো কামনার চোখে দেখে গেল। সেভ করে রাখল। সেগুলো তার ভেতর প্রবৃত্তির আগুনকে উসকে দিল। এবার তার নামাজ পড়তে ভালো লাগবে না। সে নামাজ পড়ল না। সে ধান্দায় থাকবে, কীভাবে নিজেকে যিনায় জড়ানো যায়। এভাবে একটা পাপ আরেকটাকে সাদরে সম্ভাষণ জানায়। আদর করে কাছে ডেকে আনে।

ছেলেদের ক্ষেত্রেও ওপরের কথাগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। আপনি ছেলে। আপনার নানান পোজে তোলা ছবিগুলো ছড়িয়ে দিলেন ফেসবুকের উন্মুক্ত প্রান্তরে। সেগুলো অন্য মেয়ের হৃদয়ে ঝড় তুলছে। তার ভেতরকে ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। পাপের শুরুটা এমন ছোট ছোট কর্ম দিয়েই শুরু হয়। সে জন্যই মনীষীরা বলতেন, 'পাপ হলো বিষের সমতুল্য।' বিষ যেমন অল্প হোক বা বেশি, মৃত্যু ঘটায়; তেমনি পাপও অন্তরের প্রশান্তি আর নৈতিকতাকে তছনছ করে দেয়। পাপীকে বানিয়ে দেয় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকা পাগলের মতো।

পাপে পাপ আনে। প্রথম পাপী পরের পাপের ভাগীদার হয় অঘোষিতভাবে। সুতরাং নিজে পাপ থেকে দূরে থাকুন। অন্যের পাপের কারণ হওয়া থেকেও নিজেকে বিরত রাখুন। নিজেকে শুধরে নিন। সুন্দর-শালীন ও নৈতিকতাপূর্ণ জীবনের অভিলাষী হোন। তবেই দেখবেন জীবনটা অনেক সুখময় হয়ে উঠবে।

আমার দাড়ি আমার গর্ব

আমার দাড়ি আছে। এটাকে আমি পৌরুষের প্রতীক বলে মনে করি। তাই দাড়ির কারণে কখনো হীনম্মন্যতায় ভুগেছি বলে মনে পড়ে না। তা ছাড়া এটা তো নবীরও সুন্নাহ। সুন্নাহ পালনে হীনম্মন্যতায় ভোগার তো প্রশ্নই আসে না।

আমি আমার সমাজকে দেখি। সমাজের মানুষজন আর তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখি। এগুলো দেখতে দেখতে কখনো-সখনো ক্লান্তিভারে আক্রান্ত হই। আমি দেখি, সমাজের রুচিবোধ ছিনতাই হয়ে গেছে ফ্যাশন নামক এক মহামারির হাতে। যে যখন-তখন, যেমন-তেমন বিষয়কে ফ্যাশনের মোড়ক প্যাঁচিয়ে সমাজের সামনে উপস্থাপন করছে আর বোকা সমাজ চোখ বন্ধ করে তা গিলে নিচ্ছে। নিচ্ছে তো নিচ্ছে আবার তৃপ্তির ঢেকুরও তুলছে গেলা শেষ হবার পর। কী অদ্ভুতুড়ে কারবার!

জিন্সের প্যান্ট একসময় ছিল শ্রমিকের পোশাক। খনিতে কাজ করার জন্য প্রয়োজন ছিল মোটা বস্ত্রের। তাদের জন্যই তৈরি করা হয় 'জিন্সের প্যান্ট' নামক এই মোটা বস্ত্র। এটা পরেই তারা খনিতে শ্রমিকের কাজ করত। সে সময় অভিজাত ঘরের সন্তানের জন্য জিন্সের প্যান্ট পরার কথা চিন্তা করাটাও ছিল লজ্জাজনক। তারপর ধীরে-ধীরে সময়ের গতিস্রোতে সমাজের দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে। জিন্সের প্যান্ট এখন আর শ্রমিকের পোশাক না। অভিজাত তরুণ-যুবকের ফ্যাশনের বস্ত্র হিসেবে আজ এটা স্বীকৃত। এখন আর এটা পরতে কারও লজ্জাবোধ হয় না। নিজেকে খনির শ্রমিক মনে হয় না। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে, জিন্স কিন্তু পাল্টেনি। তার মানে, সেকালে যে সমাজে জিন্সকে অভিজাত পোশাকের পরিপন্থী ভাবা হতো সেটা ছিল সেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির দোষ। জিন্সের কোনো খুঁত ছিল না। ত্রুটি ছিল না। তখনো না, এখনো না।

ফ্যাশনের এই সদা পরিবর্তনমুখর স্বভাবের কথা আমাদের কারওই অজানা নয়। ফ্যাশন এমন এক নেশার বড়ি, যেটা খাইয়ে দিলে দু দিন আগে মানুষ 'গেঁয়ো' বলত সেটাও তার কাছে হয়ে যায় 'ওয়াও কী দারুণ!'—এর অন্তর্গত। নেশাখোর যেমন মনে করে, রাস্তার পাশের খাম্বা রাস্তায় উঠে এসেছে, তেমনি ফ্যাশন-নেশায় আক্রান্ত সমাজের অবস্থাও এর থেকে তেমন বেশি ব্যতিক্রম নয়। তারা সোজাকে বাঁকা দেখে, বাঁকাকে সোজা। যেখানে পোশাকের কোনো জায়গা ছিঁড়ে গেলে পোশাকটা ফেলে দিত পরিধানের অযোগ্য বলে, ফ্যাশন-নেশার বড়ি খাবার পর ভালো পোশাকটাকেই সে ছিঁড়ে-কুটে ফ্যাশনেবল করার খেলায় মেতে ওঠে। যেই ছেঁড়া-ফাড়া দু-দিন আগে ছিল দোষ, আজ তা গুণ। আসলে ছেঁড়া-ফাড়া সব সময়ই একই অবস্থায় থাকে, পরিবর্তন হয় আমাদের মানসিকতায়, দৃষ্টিশক্তিতে। আমাদের এই চোখ আর নিজস্ব মানসিকতা তাই কখনোই ভালো-মন্দের বিচারদণ্ড হতে পারে না। এর অবস্থা অক্ষমতায় আক্রান্ত জরাগ্রস্ত সেই বৃদ্ধের মতো, যে এখন একটা বলে তো একটু পর আরেকটা বলে। মানুষের কাছে তার কথার চার আনা মূল্যও নেই। বলছিলাম দাড়ির কথা। তো দাড়ি যেহেতু পুরুষের সৃষ্টিগত একটা সৌন্দর্য, তাই একসময়ে দাড়ি রাখাকেই মনে করা হতো আভিজাত্যের প্রতীক। এরপর ধীরে ধীরে নানা কারণে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এল। এর অনেক কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা কারণ হলো, পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতির বাগডোরে বাঁধা পড়া। তাদের তাহযীব-তামাদ্দুনের বশীভূত হওয়া। ফলে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতামতের মতো গুরুত্বহীন সমাজের দৃষ্টিতে স্মার্টনেসের আবশ্যিক অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্লিন সেভড চেহারা। দাড়ি রাখলে স্মার্টনেসের জাত গেল গেল বলে রব তোলে এই সমাজ। অথচ তার খবরই নেই যে, সে সকালে একটা বলছে তো বিকেলে আরেকটা। ফলে তার এসব মতামত ফালতু ও গুরুত্বহীন।

সিংহকে দেখেছেন নিশ্চয়ই। কেমন গুরুগম্ভীর রাজসিক চেহারা। সিংহীর মধ্যে এর লেশমাত্র নেই। সে জন্যই সিংহী কখনো আমাদের আলোচনায় থাকে না। যতটা থাকে পৌরুষদীপ্ত চেহারার অধিকারী সিংহ। কবিতায়-গল্পে, সাহসিকতার উপমা-উৎপ্রেক্ষায় সিংহের উপস্থিতি যেন একটা অনিবার্য বিষয়। তার কেশই তাকে এই মাহাত্ম্য দান করেছে। সিংহও যদি সপ্তাহে সপ্তাহে নিজের এই কেশ সেভ করে তথাকথিত 'স্মার্ট' সাজতে চায়, তবে নিশ্চয়ই সেও তার এই মাহাত্ম্যের অবস্থানটা নির্দ্বিধায় হারিয়ে ফেলবে। মুরগির তুলনায় মোরগের ঝুঁটি তাকে বিশেষত্ব এনে দিয়েছে। আলাদা সৌন্দর্য প্রতিস্থাপন করেছে তার চেহারায়। ঝুঁটি দুলিয়ে সে যখন চলে, মনে হয় মহারাজ হেঁটে যাচ্ছেন। সৃষ্টিজীবের অন্যান্য প্রাণীর দিকেও তাকাতে পারেন। দেখবেন, পুরুষকে এমন কিছু দান করা হয়েছে, যা তার পৌরুষকে ফুটিয়ে তুলছে। এটা পুরুষের

স্মার্টনেসের পথে বাধা নয়; বরং এটাই তাকে স্মার্ট হতে সহায়তা করে। অবশ্য দেখার দৃষ্টি যদি হয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত তবে তো বিবেচনাবোধও নষ্ট হতে বাধ্য। আমি একবার এক রেস্টুরেন্টে নাস্তা করতে গেলাম। নাস্তা শেষে যখন বিল পরিশোধ করছি তখন ক্যাশিয়ার সাহেব কোনোরূপ প্রসঙ্গ ছাড়াই বলে উঠলেন, 'দাড়িওয়ালা হুজুররে তো মেয়েরা বিবাহ করতে চায় না।'

আমি একটু কপাল কুঁচকে জানতে চাইলাম, 'হঠাৎ আমাকে এ কথা শোনাচ্ছেন কেন?'

তিনি বললেন, আমাদের রেস্টুরেন্টের মালিকের ছেলে তাবলীগ করে। জেনারেল শিক্ষিত হলেও পুরোদস্তুর হুজুর হয়ে গেছে। মুখভর্তি দাড়ি। এখন তার বিবাহের জন্য এক জায়গায় মেয়ে দেখেছে। কিন্তু দাড়ি থাকায় মেয়ে বিয়েতে রাজি হলো না। তাই বিয়ের কথাবার্তা আর সামনে এগোয়নি।'

আমি বললাম, 'ভাই, ধরুন আপনার গন্তব্য সিলেট। এখন আপনি যদি চট্টগ্রামের বাসকাউন্টারে গিয়ে টিকেট খোঁজেন, পাবেন?'

তিনি আমার কথাটার মর্ম ধরতে পরলেন না।

বললেন, 'কী বুঝাতে চাইলেন, ঠিক বুঝলাম না।'

এরপর আমি তাকে মানেটা বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, 'ছেলে যেহেতু ধর্মীয় মাইন্ডের তাই তার জন্য ধর্মীয় মাইন্ডের মেয়েই দেখা উচিত। তা বাদ দিয়ে যদি ডিস্কো-ড্যান্সার মার্কা মেয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যান তবে তো খালি হাতেই ফিরে আসতে হবে। এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে!'

আমার কথা শুনে তিনি একেবারে চুপসে গেলেন। শুধু হালকাভাবে মাথাটা একবার ওপর-নিচ করে অন্য কাজে মন দিলেন। আমিও আর সেখান অবস্থান না করে বের হয়ে এলাম।

বেশ কিছুদিন আগে একটা ভিডিও দেখেছিলাম। ভাইরাল হওয়ার পর অনেকেই এর সমালোচনা করেছিলেন। সেখানে একটা ছেলে ঘুরে ঘুরে ভার্সিটির কয়েকটি মেয়েকে প্রশ্ন করছিল, তারা হুজুর টাইপ ছেলে পছন্দ করে কি না? মেয়েগুলো কী উত্তর দেবে সেটা সহজেই অনুমেয়। কারণ, যে মেয়ে কড়া মেকাপ মুখে মেখে ওড়নাটা গলায় প্যাঁচিয়ে দিব্যি রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে যে হুজুর ছেলে বিয়ের কথা বলবে না তা তো বলাই বাহুল্য। তার মানে কি এ, সব মেয়েরাই দাড়িওয়ালা ছেলে পছন্দ করে না? কখনোই নয়। যদি দাড়িওয়ালা কোনো হুজুর ছেলেকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি ডিস্কো-মার্কা

মেয়ে বিয়ে করবে? সেও কিন্তু নেগেটিভ উত্তরই দেবে। এখান থেকে যদি কেউ এই ফলাফল আবিষ্কার করতে যায় যে, ছেলেরা ডিস্কো-মার্কা মেয়ে বিয়ে করতে চায় না; তারা কেবল বোরকাওয়ালী খোঁজে, তবে সেটা হবে নিতান্তই বোকামিপূর্ণ কথা। মূলত দুই দিকের রুচি-স্বভাব ও চিন্তা-ভাবনার ভিন্নতা থেকে উত্তরেও ভিন্নতা আসবে এটাই স্বাভাবিক।

আমার এক বোন আছে। যে কলেজপড়ুয়া হলেও বেশ দ্বীনদার। শুধু দ্বীনদার বলাটাও ভুল হবে। প্র্যাকটিসিং মুসলিমা বলতে আমরা যা বুঝি সে ছিল ও রকম। তো তার বিবাহের প্রস্তাব এল একটা ভালো পরিবার থেকে। ছেলেও যথেষ্ট সুদর্শন ও ভালো বেতনের চাকুরে। সবদিক দিয়েই সবকিছু ঠিকঠাক। কিন্তু মেয়ে বেঁকে বসল। সে এই ছেলেকে বিয়ে করবে না। সমস্যা কী? ছেলে দাড়ি রাখলেও সেটা কাটছাট দাড়ি। পরিপূর্ণ সুন্নাহসম্মত দাড়ি রাখে না এমন ছেলের সঙ্গে ঘর করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার নেই। মা-বাবাসহ পরিবারের অন্যান্যদের চাপের মুখেও সে ছিল তার দাবিতে অনড়। তার এককথা এক দাবি। বাবা-মা বুঝিয়েছিল, বিয়ের পর ঠিক হয়ে যাবে। তুই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করে নিস। কিন্তু সে তবুও রাজি হয়নি। যে ছেলে বিয়ের আগে দাড়ি কাটছাট করতে পারে, সে যে বিয়ের পরে তা করবে না এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। শেষ পর্যন্ত ওই বিয়েটা আর হয়নি। এরপরে ঠিকই সেই বোন যেমন চেয়েছিল তেমন ছেলের সাথেই তার বিয়ে হয়েছে। চোখ-কান খোলা রেখে খুঁজলে এমন ঘটনা আরও বহুত পাওয়া যাবে। আমাদের মানসিকতা খুবই অদ্ভুত কিসিমের। কোনো ছেলে যদি দাড়ি রাখে তবে তাকে মনে করা হয় আনস্মার্ট ও সেকেলে। আবার যদি কারও দাড়ি একেবারে না-ই ওঠে তবে সেটাকেও দেখা হয় ত্রুটি হিসেবে। দাড়ি থাকাটা যাদের কাছে স্মার্টনেসের পরিপন্থী তাদের কাছে তো এটা আরও বেশি গ্রহণীয় হওয়ার কথা। কিন্তু চিত্রটা এখানে এসে বড় হাস্যকরভাবে উল্টে যায়। মানে, দাড়ি উঠতেও হবে, আবার সৃষ্টিকর্তার দেওয়া সেই সৌন্দর্যকে ছেঁচে-ছুলে নিজেদের মনগড়া সৌন্দর্যকে ধারণ করতে হবে। তবেই কিনা হওয়া যাবে তথাকথিত স্মার্ট! বিবেক-বুদ্ধিতে পচন ধরলে যা হয় আর কী! আমি দাড়িকে নিজের জন্য বেশ কিছু কারণে আশীর্বাদ বলে মনে করি। কারণ, দাড়ির কারণে আমাকে না চাইলেও অনেক পাপ থেকে বিরত থাকতে হয়। অন্য একজন চাইলেই সিনেমা হলে যেতে পারে। আমি পারি না। কারণ, দাড়ির কারণে আমার লজ্জাবোধ হয়। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আমাকে দৃষ্টি নিচু রাখতে হয়। আমি চাইলেই গানের কনসার্টে যেতে পারি না। সিগারেট ফুঁকতে পারি না। পার্কে গিয়ে গার্লফ্রেন্ড নামক বস্তুর সাথে মাখামাখি করতে পারি না। নববর্ষ, বৈশাখীসহ নানান দিবসে রমনা-টিএসসিতে গিয়ে মেয়েদের যৌন হয়রানি করতে পারি না। আমি

আরও অনেক কিছুই পারি না। এই না পারার ফিরিস্তিটা অনেক লম্বা। এতসব না পারা আমাকে কোনো দিন অখুশি করেনি। কারণ, আমি জানি, দাড়ি রেখে আমি ঠকিনি। একটা ঘটনা শুনিয়ে কথার ইতি টানি। মির্যা বে-দেল নামে একজন ইরানী কবি ছিলেন। তার কাব্যখ্যাতি যখন দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল তখন একজন লোক ভালোবেসে এল তার সাথে দেখা করতে। এসে দেখল, মির্যা সাহেব দাড়ি মুণ্ডাচ্ছেন। লোকটা বেশ অবাক হলো। কারণ, সে কবি সাহেবের মারেফতি কবিতা পড়ে ভেবেছিল তিনি মস্তবড় আল্লাহওয়ালা ও নবীপ্রেমিক হবেন। নিজের কৌতূহল দমাতে না পেরে তাই সে জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'আপনি দাড়িতে ক্ষুর লাগাচ্ছেন?' কবি সাহেব ছিলেন সুফি প্রকৃতির। যাদের দর্শন হলো অন্যকে কষ্ট না দেওয়া। তাই জবাবটা তিনি এভাবে দিলেন, 'কারও অন্তরে তো আর পোঁচ দিচ্ছি না!' এবার সেই আগন্তুক বলল, 'হ্যাঁ, আপনি পেয়ারা নবীর অন্তরে পোঁচ দিচ্ছেন।' এ কথা শুনে মির্যা সাহেব বেহুঁশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। যা অনেকটা এরকম—

"আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম,
তুমি আজ আমার চোখ খুলে দিলে;
আমি এতদিন প্রিয় হাবীব থেকে দূরে ছিলাম,
আজ তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে গেলে।"

এরপর আর তিনি কখনো দাড়ি মুণ্ডাননি।

আল্লাহর শোকর যে, তিনি শুরু থেকেই আমাকে চক্ষুষ্মান করেছেন। সে জন্যই আমার দাড়ি আমার গর্ব।

নূরানী ধোঁকা

পুকুর ঘাটে বসে আছি। পাশের বাড়ির একটা ছেলে নাশিদ শুনছে। সে আবার একটা ইসলামী দলের কর্মী। ফলে দাড়ি না রাখলেও মোটামুটি নামাজ-কালাম আদায়ের চেষ্টা করে। সমস্যা হলো, তার শোনা নাশীদের কথাগুলো ইসলামিক হলেও তা বাদ্যযুক্ত। গায়ক সাহেব বাদ্যের তালে তালে সুর তুলছেন। আল্লাহ-রাসুলের নাম জপছেন।

আমি তাকে বললাম, 'তুমি যে এটা শুনছ তা কি উচিত হচ্ছে?'

সে ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই বলে দিল, 'আমি তো আর গান শুনছি না!'

তার কথা শুনে আমি ক্ষণিকের জন্য থ হয়ে গেলাম। যেহেতু ছেলেটা মোটামুটি নামাজ-কালাম পড়ে এবং ইসলামী একটা রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত, তাই ভেবেছিলাম অন্তত এতটুকু বিষয় তার বুঝের বাইরে থাকবে না। কিন্তু আমাকে চরম হতাশ হতে হলো। কারণ, সে এই বাদ্যযুক্ত সংগীতের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে আমার সাথে রীতিমতো তর্ক শুরু করে দিল।

যার সংগীতটা সে শুনছিল তার নাম ইকবাল হোসেন জীবন। বাংলাদেশি গায়ক হলেও তিনি পুরোপুরি লেবানিজ বংশোদ্ভূত সুইডিশ গায়ক মেহের জাইনকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেন। মুখে তার মতোই খোঁচাখোঁচা দাড়ি। গাওয়ার স্টাইল আর ভিডিওগুলোও তার সংগীতের অনুসরণে করা। তো ছেলেটা আমাকে যুক্তি দিল, 'ইকবাল যখন বাদ্য ছাড়া এমনি গাইত তখন তার অত নামডাক ছিল না। এখন দেখেন সে বিদেশেও প্রোগ্রাম করে। ইসলামী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রসারে এটা তো কম না ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার এ ধরনের কু-যুক্তি শুনে আমার বিস্ময়ের মাত্রাটা আরও কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গিয়েছিল।

এ ধরনের মানসিকতা পোষণ করার মানুষ বর্তমান সময়ে নেহায়তই কম না। আধুনিকতার নামে তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করতে একটুও কসুর করে না। ইসলামের বিধি-বিধানগুলো নিজেদের মন-মাফিক করে নেয়। তারপর সে অনুপাতে তার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সেটাকে বৈধতা প্রদানের কসরত চালায়। এ ধরনের মানসিকতা যে খুবই ভয়ংকর, তা তো বলাই বাহুল্য। এর সর্বনিম্ন ক্ষতিটা হলো, এতে করে সুপথে আসার রাস্তাটা আর খোলা থাকে না। কারণ, কাজটা করাই হয় জায়েয জ্ঞান করে। ফলে এর সাথে জড়িত হওয়ার পর সেখান থেকে ফিরে আসার প্রয়োজন তাদের মনে কখনো উদিত হয় না।

আমি বছরখানেক আগে রমজান মাসে গিয়েছিলাম এলিফ্যান্ট রোডের একটা মার্কেটে। আমার এক বন্ধুর দোকান ছিল ওই মার্কেটে। সেখানে গিয়েও একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হলো। মার্কেটে ফুল সাউন্ডে একজন ব্রিটিশ গায়কের বাদ্য-বাজনাযুক্ত কথিত ইসলামী সংগীত লাগানো হয়েছে। তিনি তার সুরেলা গলায় গেয়ে চলেছেন হাসবি রব্বি জাল্লেল্লাহ... অন্য সময় হয়তো সেখানে বাংলা-হিন্দি বা ইংরেজি গানের মহড়া চলে। কিন্তু এখন রমজান মাসের দিনের বেলা বলে তারা একে সম্মান দেখাচ্ছে। গানের পরিবর্তে ইসলামী সংগীত চালানোর চেষ্টা করেছে। ভাবটা এমন যে, বাদ্যযুক্ত এসব গানে আল্লাহ-রাসুলের নাম আছে বিধায় এগুলো সব ইসলামী সংগীত, হালাল গান। শুনলে কোনো সমস্যা নেই। অথচ এগুলোতে বাদ্যের ব্যবহার ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো গানের চেয়েও বেশি কড়া। জাহালাতের আধুনিক সংস্করণ বোধহয় একেই বলে!

সেই মার্কেটে যে সংগীতটা চলছিল তার কথাগুলোর মধ্যে কয়েকটা লাইন এমন ছিল, 'ও আল্লাহ দি অলমাইটি, প্রোট্যাক্ট মি এন্ড গাইড মি... হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ।' মানে, হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আমাকে রক্ষা করো এবং পথ প্রদর্শন করো... মহান রব্ব আমার জন্য যথেষ্ট। আমি ভেবে পেলাম না, আল্লাহ তাআলা যেই বাদ্য-বাজনাকে নিষেধ করেছেন তা উপেক্ষা করে যারা বাদ্য-যন্ত্রযোগে সংগীত পরিবেশন করছে এবং শুনছে, কীভাবে তিনি তাদের এই রক্ষা করার ও সুপথ দেখানোর প্রার্থনা কবুল করবেন? তাদের জন্য কীভাবে তিনি যথেষ্ট হতে পারেন! কারণ, আল্লাহ তাআলা তো সেসব লোকদের পছন্দ করেন না, যারা তাঁর অবাধ্যতায় মেতে থাকে। সুতরাং তিনি তাদের জন্য যথেষ্ট হবেন এটা বাতুলতা এবং সংগীতের একটা অযাচিত কথা বৈ আর

কিছু না; বরং এ কথা বলাই যথার্থ ও সমীচীন হবে যে, এটা দুআ ও আল্লাহর নাম নিয়ে করা একধরনের নিকৃষ্ট মশকরা।

মূলত একটা সংগীত জায়েয থেকে নাজায়েযের গণ্ডিতে তখনই প্রবেশ করে যখন তার মধ্যে দুইটি বিষয়ের কোনো একটি পাওয়া যায়। প্রথম হলো, যদি তাতে শরীয়ত-বহির্ভূত ও গর্হিত কোনো কথা থাকে। যেমন : হারাম প্রেমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, কুফুরী-শিরকী বাক্য মিশ্রিত থাকা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় হলো, বাদ্য-যন্ত্রের উপস্থিতি থাকা। সুতরাং যেসব সংগীতের কথামালা ইসলামী কিন্তু তাতে বাদ্যযুক্ত করা হয়েছে, সেটা হারাম সংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। গানের ব্যাপারে শরীয়তে যেসব নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেগুলো এর জন্য প্রযোজ্য হবে। সাধারণ গান গাওয়া ও শোনার কারণে একজন মুসলিম যেসব শাস্তি ও ধমকের উপযুক্ত হয়, এ-জাতীয় ইসলামী লেবেল লাগানো সংগীত গাইলে বা শুনলেও তার বিধানও অপরিবর্তিতই থাকবে। উভয়ে শ্রেণিই হারামে লিপ্ত বলে ধরে নেওয়া হবে; বরং বলা যায়, ইসলামের ছদ্মাবরণে হওয়ার কারণে অনেক সরলপ্রাণ মানুষ, যারা সাধারণত গান-টান শোনেন না, তারাও যেহেতু অনেক সময় ধোঁকায় পড়ে যায়, তাই এ ক্ষেত্রে গায়কদের জন্য শাস্তির পরিমাণটা আরও কঠোর হবার কথা।

সংগীত শোনাটা আমাদের সমাজে এখন মহামারির আকার ধারণ করেছে। প্রযুক্তির সহজলভ্যতা এই পাপটাকে আরও গতিশীলতা ও ব্যাপকতা এনে দিয়েছে। মানুষ এখন অবসর সময়টুকু এসব বে-ফায়দা ছাইপাশ শুনেই কাটিয়ে দেয়। হয়তো সে বাসে করে অফিসে বা অন্য কোথাও যাচ্ছে। তো সিটে বসেই এয়ারফোনটা কানে গুঁজে সারাটা রাস্তা এভাবে পাপের ভেতর নিজেকে অবগাহন করাবে। এটাই এখনকার সময়ের সাধারণ চিত্র। অথচ এই সময়টুকু সে তেলাওয়াত বা কোনো জ্ঞানগর্ভ লেকচার শুনে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারত। নিদেনপক্ষে বাদ্যযুক্ত সংগীত পরিহার করে গুনাহমুক্ত ধর্মীয় সংগীত শুনতে পারত।

অনেকেই আছে কিছুটা ধার্মিক হবার কারণে প্রচলিত গান-বাজনা থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু ইসলামী সংগীতের নামে বাদ্য-বাজনাযুক্ত এসব নাশীদ ঠিকই শোনেন। তারা ভাবেন, এটা তো ইসলামী সংগীতই। এটাকেই বোধহয় বলে 'নূরানী ধোঁকা'। কারণ, শয়তান অনেক সময় মুমিনদের যখন সোজাপথে কুমন্ত্রণা দিয়ে বশ করতে পারে না তখন নূরানী ধোঁকার জাল বিছিয়ে দেয়। যেটাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে ভালো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মূলত শয়তানের কর্মকাণ্ডেরই একটা পরিশীলিত রূপ। যেন মধুর লেভেল আঁটা বোতলে মদের পরিবেশন।

চলুন একটু দেখে আসি কুরআন-হাদীসে বাদ্য-বাজনাযুক্ত সংগীতের বিষয়ে কী বলা হয়েছে। শুরুতেই পবিত্র কুরআনুল কারীমে নজর বুলাই। আল্লাহ তাআলা বলছেন, "একশ্রেণির লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে 'লাহওয়াল হাদীস' সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং সেটাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।"[৩]

এখানে আয়াতে 'লাহওয়াল হাদীস' দ্বারা কী উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত তাফসীরকারক সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহুআনহু বলেন, 'এটা গান এবং এ-জাতীয় কিছুকেই বোঝায়।'[৪]

অন্য আরেক বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহুআনহু তো আরও জোরালো ভাষায় বলেন, 'আমি সেই সত্তার কসম করে বলছি, যাকে ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, এখানে গানের কথা বলা হয়েছে।'[৫]

যারা গান গায় এবং শোনে তাদের উভয়ের জন্যই এই আয়াত একটা চরম ধরনের হুমকি। তাদের জন্য এখানে অবমাননাকর শাস্তির হুকুম শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী সংগীতের ছদ্মাবরণে যারা বাদ্যযুক্ত সংগীতকে বৈধ সাব্যস্ত করতে চায়, তাদের বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশাতেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।"[৬]

আমি যখন দেখি কোনো ভাই এ-জাতীয় সংগীতগুলোর পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন, তখন নবীজীর এই হাদীসটার কথাই মনে পড়ে যায়। কত সরলভাবেই না তিনি আমাদের এমন একটি অনাগত ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

সাহাবীরা বাদ্যযন্ত্রের বিষয়ে কত হুঁশিয়ার ছিলেন সে বিষয়ে একটা ঘটনা শোনাই। একবার বিশিষ্ট সাহাবী ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহুআনহু কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলেন। কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই কানে আঙুল দিয়ে দিলেন। যাতে বাদ্যের আওয়াজ তাঁর কানে না আসতে পারে। সাথে ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ নাফে রাহিমাহুল্লাহ। তিনি কিছু দূর গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস

---

[৩] সুরা লুকমান, ৩১ : ৬
[৪] তাফসীরে তাবারী, ১৮ : ৫৩৫
[৫] প্রাগুক্ত, ১৮ : ৫৩৪
[৬] সহীহ বুখারী, ৫৬৪৯

করলেন, 'নাফে, তুমি কি এখনো কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ?'

যখন নাফে রাহিমাহুল্লাহ 'না' বললেন, তখন তিনি কান থেকে হাত সরালেন। তারপর তাকে জানালেন যে, একবার তিনি নবীজির সাথে ছিলেন। তখন এ রকম বাদ্যের আওয়াজ শুনে তাকে তিনি এমনই করতে দেখেছেন।[৭]

সাহাবীদের আদর্শ কেমন ছিল আর আমরা কেমন! দুইয়ের মধ্যে কত আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেও যাতে বাদ্য শুনতে না হয়, সে জন্য কানে আঙুল দিয়ে দিতেন। আর আমরা সেই গান-বাদ্য শোনার জন্য কানে ইয়ারফোন গুঁজে দিই। আবার তাকে বৈধ সাব্যস্ত করার জন্য টালবাহানাও করি। আল্লাহ-রাসুলের স্তুতিগাথাকে বাদ্যের নাপাক আওয়াজে কলুষিত করি। এরচেয়ে বড় হঠকারিতা আর কী হতে পারে! আমার কাছে তো সাধারণ বাদ্যযুক্ত গানের তুলনায় এসব ইসলামী (?) সংগীতকে আরও বেশি মারাত্মক মনে হয়। কারণ, সাধারণ গান-বাজনা যারা শোনে, তারা একে পাপ জেনেই শুনে। নফসের বেড়াজালে বন্দী হওয়ার কারণে পাপ জেনেও এটি করে যায়। ফলে সময়ের পরিবর্তনে তার নিজের ভেতরেও কোনো একদিন পরিবর্তন চলে আসতে পারে আশা করা যায়। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কায়মনোবাক্যে রব্বের দরবারে অনুতপ্ত হবে প্রত্যাশা রাখা যায়। কিন্তু ইসলামের লেবেল লাগানো এসব সংগীতের ক্ষেত্রে শ্রোতার মনে পাপের সেই অনুভূতিটাই থাকে না। সে ভাবে, আমি তো খারাপ কিছু শুনছি না! এর মধ্যে তো আল্লার গুণগানই গাওয়া হচ্ছে। বা নবীজীর স্তুতি-কীর্তন করা হচ্ছে। ফলে তওবা করার ভাগ্য তার নসীবে আর জোটে না। তো পাপকে পাপ মনে করে করার তুলনায় অ-পাপ মনে করে করাটা যে বেশি ভয়ংকর ও বিপজ্জনক, সেটা তো বলাই বাহুল্য।

অনেক সময় দেখা যায় এসব বাদ্য-বাজনাযুক্ত কথিত ইসলামী সংগীতই ধীরে ধীরে একজন মানুষকে গান-বাদ্যের প্রতি ধাবিত করে। তার হৃদয়ে মিউজিকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। পূর্বে গান-বাদ্যের প্রতি যে একটা ঘৃণাবোধ ছিল সেটাকে আস্তে আস্তে বিদূরীত করে দেয়। কারণ, মানুষের একটা প্রকৃতিজাত স্বভাব হলো, সে কোনো কাজের প্রতি একসাথে হুট করে ঝুঁকে পড়ে না; বরং এটা সময়ের স্রোত ধরে অল্প অল্প করে সেটা সংঘটিত হতে থাকে। যেমন : যে ছেলেটা চরম পর্যায়ের নেশাখোর, তার নেশার শুরুটা মদ-হিরোইন দিয়ে শুরু হয় না সাধারণত। হয় সিগারেটের মতো হালকা বস্তু দিয়ে। সেই হালকা বস্তুটার হাত ধরে একসময় সে নেশার জগতের আরও গভীর থেকে গভীরে ডুব দেয়। ভেসে যায় উন্মাদনার উত্তাল স্রোতে। তাই এসব বাদ্য-

[৭] মুসনাদে আহমাদ, ৪৫৩৫